আবদুল মান্নান সৈয়দ

মাটির তিলক-রেখাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি বলে গণ্য করব... ।
[নাসিমের স্বগতোক্তি, প্রথম অধ্যায়: তৃতীয় খণ্ড, নতুন দিগন্ত সমগ্র]

১

কে এই আবদুর রউফ চৌধুরী? ২০০৩ সালে যখন 'পাঠক সমাবেশে'র বিজু শাহেব আমাকে *পরদেশে পরবাসী: ইংল্যান্ডের দিনগুলি* (পাঠক সমাবেশ সংস্করণ, ২০০৩) বই-এর প্রেসকপি হাতে দিলেন, তখন আমার মনে এই প্রশ্নই প্রথম জেগে উঠেছিল। বৃহত্তর সিলেটের দার্শনিক-সাহিত্যিক দেওয়া মোহাম্মদ আজরফ বা কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলীর সঙ্গে পরিচয় ছিল ভালভাবেই; কবি দিলওয়ার তো এখনো কবিতা লিখে চলেছেন, কিংবা গত বছরে (২০০৪) প্রয়াত কবি আফজাল চৌধুরী তো ছিল আমাদের সমসাময়িক বন্ধুই; বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার প্রবর্তয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী তো সর্বশিক্ষিতজনপরিচিত; সিলেটের তরুণ-প্রবীণ মৃত-জীবিত আরো অনেক লেখক-কবি-সমালোচক-গবেষক তো আছেনই; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন হাসন রাজা-র কথা। বাস্তবতা-আধ্যাত্মিকতার একটি পরুষে-পেলবে মিশেল ধারার সিলেটের লেখকদের সাহিত্যচর্চায় প্রবহমান। কিন্তু এতসব লেখকদের মধ্যে আবদুর রউফ চৌধুরীর নাম পর্যন্ত অশ্রুত ছিল আমার। আবদুর রউফ চৌধুরীর *পরদেশে পরবাসী* বই-এর ভিতরে যত প্রবেশ করতে লাগলাম, তত অনুভব করলাম আমি এক অজানা অভিজ্ঞতার শরিক ও স্নাতক হয়ে চলেছি। ভিতর থেকে ধ্বনিত হলো একটি স্বতঃস্ফূর্ত 'বাহাবা'! পরিষ্কার বোঝা গেল: এঁর সঙ্গে ঠিক সিলেটের অন্যকোনো লেখকের সঙ্গেও সাযুজ্য নেই। আবদুর রউফ চৌধুরী এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর, এক ভিন্ন ঘরানা।

কারণ হয়তো আবদুর রউফ চৌধুরীর (জন্ম ১৯২৯ – মৃত্যু ১৯৯৬) সংগ্রাম-উন্মুখর বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে উপরি-উক্ত লেখকদের তো বটেই, বাংলাদেশের গড়পড়তা অন্য লেখকদের মিল নেই কোনো। আত্মজৈবনিক *পরদেশে পরবাসী* উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বিলেতের পটভূমিকায় লেখা সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপ উপন্যাসের কথা মনে পড়েছিল। তবে, এটাও ঠিক, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আবদুর রউফ চৌধুরীর ব্যবধি আসমান-জমিন। আসল কথা: আবদুর রউফ চৌধুরীর মূলধন তাঁর বিচিত্র ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতা, তাঁর জীবনবীক্ষাও স্বভাবত স্বতন্ত্র। মেধাবী ছাত্র ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে আকাডেমিক লেখাপড়া ঠিকমতন সম্পন্ন করতে পারেননি। ছোট ব্যবসা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছেন; ছোট চাকরি করেছেন; তারপর স্কুলশিক্ষকতা; পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান; বিমানবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর দেশে ফিরে বিলেতে যান– এবং সেখানে ছোটখাটো নানা কাজ করে শেষে স্থিত হন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে। সেখানেও দীর্ঘকাল চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ করে দেশে ফেরেন। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয় জন্মভূমি হবিগঞ্জে। আবদুর রউফ চৌধুরীর এই সংগ্রামী-কিন্তু-শেষপর্যন্ত-সফল জীবনচিত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়: এক. শতব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখির চর্চা তিনি অবিরলভাবে চালিয়ে গেছেন (মূলত গদ্য– কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধাদি); দুই. তাঁর স্বাধীনতার উন্মুখিতা, বিপ্লবী-বিদ্রোহীদের সহকারিতা (১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অন্যতম সহকারী হিশেবে কাজ করেছেন)।

কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাস-শিশুসাহিত্য সবই লিখেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী; কিন্তু জীবন বিষয়ে সার্বিক কৌতূহল-সন্ধিৎসা-জিজ্ঞাসা তাঁকে মূলত-ঔপন্যাসিক করে তুলেছে। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জেনেছি : জীবনের উপান্তে তিনি বিলেত থেকে ফিরে দেশে স্থিত হয়েছিলেন, হবিগঞ্জে, তখন আমাদের লোকপ্রিয় উপন্যাসধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এখানেই আসলে প্রতিটি লেখকের নিঃশব্দ সংগোপন সাহিত্যসূত্র : পূর্বজ বা সমসাময়িক সাহিত্যধারায় তিনি সন্তোষ পান না বলেই কলম ধরেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই পঙক্তিটি সব লেখকের অন্তরের কথা : 'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা।' তাঁর পারিবারিক সূত্রে জেনেছি : আবদুর রউফ চৌধুরী ঠিক উপন্যাস লিখতে চাননি, তাঁর মনের (অভিজ্ঞতার, বাস্তবের, স্বপ্নকল্পনার) কথা জানাতে চেয়েছেন। আবদুর রউফ চৌধুরী উপন্যাস লিখতে চান বা না-চান, তিনি – শেষ বিশ্লেষণে – উপন্যাসই লিখেছেন। *পরদেশে পরবাসী*-ও উপন্যাস, *নতুন দিগন্ত*-ও উপন্যাস। মনে হয় : *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসটি লেখকের একটি উচ্চাশী উপন্যাস, বহুদিনের পরিকল্পিত : প্রথম খসড়া ১৯৬৮-৬৯ সালে, চূড়ান্ত রূপান্তরণ ১৯৯৪-৯৫ সালে; বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড যুক্ত হয়ে নতুন দিগন্ত সমগ্র শিরোনামে অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ঠিক কোন্ সময়ের লেখক আবদুর রউফ চৌধুরী? গ্রন্থাকারে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ষাটের দশকে। চল্লিশের দশকে আমাদের গল্পে-উপন্যাসে যে-আধুনিকতা শুরু হয়, আবদুর রউফ চৌধুরী তারই উত্তরসাধন। পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্যিকদের – আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, রাবেয়া খাতুন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আহমদ মীন, হুমায়ুন কাদির, মুর্তজা বশীর প্রমুখ – সমসাময়িক হিশেবে তাঁকে বিচার করা যায়। তাঁর বাস্তবতার অনুধ্যানও খানিকটা মেলে আলাউদ্দিন আল আজাদ-জহির রায়হানদের সঙ্গে। যদিও আবদুর রউফ চৌধুরীকে ঠিক এরকম কোনো প্রকোষ্ঠে ধারনো যাবে না। ঢাকায় তিনি অধিবাস করেননি;– এমনকি অভিবাসী হয়েও লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১) বা শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-৯৭)-এর যে-যুক্ততা ছিল ঢাকার সঙ্গে, তা তাঁর ছিল না। জীবৎকালে তিনি দেশবিদেশের নানা জায়গায় থেকেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পরেই যেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ আবিস্কৃত হচ্ছে।

২

'উপন্যাস কীসে উপন্যাস হয়ে ওঠে, তা কারও কাছেই সুস্পষ্ট নয়; এর কারণ হয়ত এই যে, কোনও সৃষ্টিকর্মই প্রথাকে অনুবর্তন করতে বাধ্য নয়। প্রত্যেকটি রচনাই অনন্য; তাই কোনও সংজ্ঞায় খুব বেশি দিন একে ধরে রাখা যায় না। নানা বৈচিত্র্যে মানবসৃষ্ট জগৎও ক্রমশই বিপুলায়তন হয়ে ওঠে; তাই আমার লেখা উপন্যাস হয়েছে কী-না, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি যা দেখেছি এবং অনুভব করেছি তার সঙ্গে আমার কল্পনাকে মিশিয়ে এই জগৎটি নির্মাণ করেছি।' – *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসের প্রবেশকে একথা লিখেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী। এক-হিশেবে কাহিনী-চরিত্র-ঘটনার বুনোটে তৈরি এই আখ্যানটি নিতান্তই প্রথানুগ, একটি স্পষ্ট আরম্ভ এবং একটি পরিষ্কার সমাপ্তি আছে এতে, আছে অন্তর্বর্তী কাহিনীর পরম্পরা, তাহলে উপন্যাসের ভূমিকায় একথা লিখতে গেলেন কেন আবদুর রউফ চৌধুরী : '... কোনও সৃষ্টিকর্মই প্রথাকে অনুবর্তন করতে বাধ্য নয়।' অতি সত্য কথা। কিন্তু তখনই আমাদের খুঁজতে হয় প্রথাভঙ্গ কোথায় ঘটেছে এ উপন্যাসে।

প্রশ্ন ওঠে : *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসটি কি রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক? জবাবটিও আপনা থেকেই চলে আসে : *নতুন দিগন্ত* ততটাই রাজনৈতিক/ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যতখানি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রাজসিংহ*

উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শত শত উপন্যাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে, আবদুর রউফ চৌধুরীর *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসও এক-হিশেবে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ভাবনা-আদর্শকে একটি সারাৎসারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এখানে, প্রায় একটি প্রতীকে, বাস্তবতার একটি ভিন্ন আয়তনে। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গড়পড়তা বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে এর পাথৃক্য এখানে, যে, একে স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশের কোথাও নয় – করাচিতে, যে-মহানগর ছিল পাকিস্তানেরই একসময়কার রাজধানী, উত্তরকালে পশ্চিম-পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের একটি প্রধান নগর, যেখানে অনেক বাঙালির সঙ্গে আমাদের লেখকও অবস্থান করেছেন বেশ কিছুকাল। (আমাদের খ্যাতিমান কথাশিল্পীদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আবু ইসহাক ছিলেন এই নগরে। তারও অনেক আগে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম – তাঁর প্রথম সাহিত্যচর্চার স্থানই ছিল করাচি।) খুব কাছ থেকেই আবদুর রউফ চৌধুরী লক্ষ্য করেছেন সেখানকার মানুষের বাঙালি-বিদ্বেষ, পূর্ব-পাকিস্তান-ঘৃণা। (আবু ইসহাক বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনায় এরকম কোনো প্রকাশ নেই।) এই পটভূমিকায় আমাদের লেখক নিয়ে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত আগের কয়েকটি বছরের উত্তাপ ও জটিলতা ও সূচিমুখ একাগ্রতা। রাজনীতির দাবাখেলার এক সর্বোচ্চ চরিত্র – জুলফি আলি ভুট্টো, যার নাম দিয়েছেন তিনি (কোথাও বলেননি তিনিই স্বনামধন্য-বা-ঘৃণ্য জুলফিকার আলি ভুট্টো); তার বিপ্রতীপে করাচির সর্বহারা দল 'ওয়ার্কার্স ফ্রেণ্ডস ক্লাব'-এর সাধারণ একজন মানুষ নাসিম – যে ক্রমশ হয়ে ওঠে এই উপন্যাসের কেন্দ্রনায়ক।

'শরৎকাল। কী বিচিত্র শোভা! রোববার। বৈকালিক সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে।' – উপন্যাসের শুরু হয়েছে এরকম একটি শান্ততায় আনন্দে আলস্যে। তুলনায় এই দীর্ঘ উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের ঘটনাবলি অতিদ্রুত, নাটকীয়। যেন আলসে-বিলাসে নির্মিত এই নির্মিত এই উপন্যাসটি ফল প্রসব করছে অন্তিমে গিয়ে– একটি রক্তিম ফল। যেন শোষিত পূর্ব-পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের যাতনা নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামোত্তর বিজয়ের প্রতীকের মতন। পুরো উপন্যাসটিতে ঘটনার ঘনঘটা নেই, আছে নিবিড় বর্ণনা, জীয়ন্ত কথোপকথন। চরিত্রপাত্রের মধ্যে যে খুব অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছে (যেমন ঘটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) তেমন নয়, বরং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এ যেন অনেকখানি বহিরঙ্গে বিন্যস্ত। কিন্তু এই বহিরঙ্গ জগৎটি একরঙা নয় – বহুবর্ণিল। এর মধ্যে ব্যক্তির আশা-ক্ষুধা-রাজনীতি-হিংসা-প্রেম-অপ্রেম-যৌনতা সমস্তই মিলমিশ করে আছে। উঁচুতলার ভুট্টো প্রমুখের আর নিচুতলার নাসিম প্রমুখের জীবনযাপনের ধারা চলতে চলতে একসময় একটি চূড়ান্ত ক্রান্তিরেখায় এসে মিলেছে – বইরের উপান্তে। গ্রন্থের প্রারম্ভিক দুটি অধ্যায়ই নির্দেশ দিচ্ছে লেখকের অভীপ্সার ও প্যাটার্নের।

প্রথম অধ্যায়। স্থান : আল মুরতুজা ভবন (ভুট্টোর প্রাসাদ)। চরিত্রপাত্র : ভুট্টো + আন্নী (পরিচারিকা) + নূর মোহাম্মদ (পরিচারক) + বেনফরত (ভুট্টোর তৃতীয় স্ত্রী, ইরানি) + আবদুল্লাহ খুরো (উপ-মন্ত্রী)। এই প্রথম অধ্যায়েই মিশেছে রাজনৈতিক সংলাপের সঙ্গে মদ্যপান আর যৌনতার আবেগ-আবেশ। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভুট্টোর দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য সৎ নয় – তা সত্য; এতদিনে এ-সত্য কথাটি আপনাদের বোধোদয় হল বুছি? কিংবা 'আমি ভেবে সত্যি আশ্চর্য হই, আপনারা – প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ কী করে পাকিস্তানের জন্মশত্রুর সঙ্গে হাত মিলাতে উদ্যত হতে পারেন?' অথবা আইয়ুব খুরোর উক্তি : 'পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রাধান্য রক্ষা করার জন্ন আমরা করতে না-পারি এমন কোনও কাজ নেই। শয়তানের সাহায্যে, বেশ্যার সাহচর্যে যদি পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা হয় তবে তাতেও আমরা পিছু-পা হব না।' ভুট্টো সম্পর্কে লেখক তাঁর মনোভাব গুপ্ত রাখেননি। মদ্যপ ভুট্টোর টানে যখন ভুট্টোর স্ত্রীর সামনেই শরীরিণী পরিচারিকা তার কোলে এসে পড়ে, তখন ভুট্টো সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : 'তেলাপোকা যা পারে ভুট্টো যেন তা করতে

সক্ষম।' কিংবা 'এরকম ব্যবহার করা পর-নারীর সঙ্গে ভুট্টোর দোষ নয়, দোষ তার রক্তের।' অথবা ভুট্টো-সংপৃক্ত মানুষজন সম্পর্কে লেখকের ধারণা-ভাবনা মোটেই সশ্রদ্ধ নয়। মদ্যপানরত ভুট্টোর স্ত্রী বেনফরত আর আইয়ুব খুরো সম্পর্কে : '... ক্ষণিকের মধ্যে উভয়ে এমন এক রাজ্যে চলে গেল যেখানে সামাজিক নীতিবোধের কোনও আর বালাই রইল না।' তবে এই সবই পরিপ্রেক্ষিত মাত্র। কেন্দ্রীয় বিষয় অন্যত্র। যেমন, ভুট্টোর উক্তি : 'কাশ্মির গতকালের কলঙ্ক, আগামীদিনের প্রশ্ন; কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান আজকের সমস্যা।' এই সমস্যা সমাধানের আতীব্র ইঙ্গিতেই *নতুন দিগন্ত* উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। রাজনীতি-ভাবনার অন্য প্যাঁচও আছে : 'ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হলে শেখ মুজিবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করা যাবে; আর এই কঠিন কাজ তার জন্য বিরাট এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেবে। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং তারপর ...।' সংলাপের বিরামচিহ্ন লেখকেরই – আমাদের নয়। অবশ্য এটা কার্যকরী হয়নি, বা কার্যকরী করা যায়নি, হলে ইতিহাস হতো অন্যরকম। রউফ চৌধুরীর উপন্যাসে ভুট্টো চরিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় : রাজনীতিতে ব্যক্তিস্বার্থ কতখানি শ্লিষ্ট থাকে। ভুট্টোর এবং অন্যদের ব্যক্তিজীবনের অনুপুঙ্খও গাঢ় রঙে খচিত হয়ে আছে এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। ভুট্টো-কন্যা নাসিমার সঙ্গে ভারতের নবনিযুক্ত মন্ত্রী নবাবজাদা খুরশেদ আহমেদ পাতৌদির সম্পর্ক তৈরির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবন-আর-রাজনীতিজীবনের কাটাকুটি-খেলা গভীরভাবেই অঙ্কিত করেছেন লেখক। খানিকটা-বাস্তব-অনেকখানি-কল্পিত উপন্যাসের এই প্রথম পরিচ্ছেদেই অন্তত বাস্তবতার একটি প্রতিভাস রচনা করতে সমর্থ হন লেখক।

দ্বিতীয় অধ্যায়। স্থান : করাচি অভিমুখী রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। পরে করাচির ম্রিয়মাণ শেরশাহ কলোনির একটি ছোট খুপরি ঘর। পাত্র-পাত্রী : নাসিম + সেপাই + ফারুক + যতীন + মতিন + পারভেজ। ট্রেনের থার্ড ক্লাস কামরার তেমনই বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, যেমন দিয়েছেন তিনি ভুট্টোর বাসভবন 'আল-মরতুজা'র। যেমন : 'ধীরস্থির শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাসিম দেখতে লাগল সেপাই দুটি উঠে বসে অজায়গায়-কুজায়গায় দৃকপাত করে বিস্তর গোল করছে। সামনের স্টেশনে নামবে বোধ হয়। কৃষক-বউয়ের উপর অল্পবয়সের সেপাইয়ের নজর পড়তেই তার জিব লকলক করে ওঠে; চুচুক-চুষে জিবের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য। তার দৃষ্টিতে যেন ডাকিনী-যোগিনীরা নেচে বেড়াচ্ছে। রূপসীর নরম-কোমল রক্তমাংস চিবিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে মুখের পেটানো পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে।' সেপাই দুটির প্রতি লেখকের যে-বিতৃষ্ণা তা অবাঙালি বলে নয় – কৃষক বউটিও তো বাঙালি। কৃষক বউ-এর প্রতি লেখকের যে অগুপ্ত দরদ তা আছে ভুট্টোর পরিচারিকা আন্নীর প্রতিও। কেবল আন্নীর বিষয়ে লেখক বলেই নিয়েছেন যুগ-যুগান্তরের সংস্কার, যে, প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হবে, সিন্ধু অঞ্চলের নিয়ম যে নববধূকে জমিদারের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হবে – আন্নী তারই তাঁবে চলে। অন্যত্র আমরা দেখি : নারীর প্রতি লেখকের সমানুভূতি (যদিও এই উপন্যাসে কোনো নারীচরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি)। আসলে লেখক দেখাতে চাচ্ছেন দুটি শ্রেণী – উপরমহলের মানুষজন একদিকে, আরেকদিকে নিচুতলার মানুষ। করাচি স্টেশনে নাসিমকে নিতে এসেছে ফারুক, যতীন ও মতিন। খুঁটিনাটির দিকে লেখকের তীক্ষ্ণ নজর বলেই যতীন চক্রবর্তী ও মতিনের শারীরিক বিবরণও দিয়েছেন : 'যতীন যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। বয়স চল্লিশের কম নয়। নাসিমের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হবে। চুলে পাক ধরেনি বলে বয়স একটু কমই দেখাচ্ছে। মতিন অবশ্য যতীনের অনেক ছোট। চুলে কদম ছাঁট। ছোট করে ছাঁটা দাড়ি, যা বয়সকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছে। গোলগাল চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা। শক্তসমর্থ পুরুষ।' এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সারা উপন্যাসটিকেই বাস্তবতা নির্মাণে সহায়তা দিয়েছে। লক্ষণীয় : দুই এলাকাতেই লেখকের সাবলীল বিহার। 'আল-মরতুজা' ভবনের ধনী অধিবাসীবৃন্দ (আন্নী এবং নূর মোহাম্মদের মতন পরিচারিকা-পরিচারকরাও) এবং 'ওয়ার্কার্স ফ্রেণ্ডস ক্লাব'-এর সদস্যেরা – লেখক দু-

জায়গারই এবং দু-জায়গার মানুষ-মানুষীকে রূপায়িত করেছেন সমান উৎসাহে। দীর্ঘায়তন এই উপন্যাসের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি যে উপন্যাসের প্রথম থেকেই ছিল লেখকের, এই দুটি পরিচ্ছেদ থেকেই তা প্রমাণিত। দুটি পরিচ্ছেদেই আমরা দেখতে পাই একটি প্রসারণ – বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন অতীত, এবং সব-মিলিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী নির্দেশ। পাঠ থেকে, স্মৃতি থেকে, সংলাপ থেকে, টেলিগ্রাম থেকে লেখক বারবার চলে যাচ্ছেন অতীতে ও বর্তমানের বিশ্লেষণে, সব-মিলিয়ে বৃহৎ একটি পটভূমি নির্মাণে। প্রথম পরিচ্ছেদে যেমন, তেমনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে লেকক তার অভীপ্সিত গন্তব্যের দিকে চলেছেন। কিন্তু লেখকের কোনো দ্রুততা নেই, চারপাশের ছবি আঁকতে আঁকতে এগিয়ে চলেছেন তিনি। এই উপন্যাস যে প্রায় তিরিশ বছর ব্যাপী প্রচেষ্টার ফল তা লুকানো থাকে না। লেখকের লক্ষ্য যে স্থির তা এরকম তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনার মধ্যেও প্রতিফলিত : 'গোসলের পানি হয়ত ভালো ছিল না। পাইপ দিয়ে কোত্থেকে পানি আসছে কে জানে; নর্দমার নয়ত! মানুষ ত তা-ই খেয়ে বেঁচে আছে, বাচ্চা বাড়াচ্ছে, গিজগিজ করছে – উদ্বাস্তুদের জন্য এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কী করতে পারে সরকার? যে-সরকার নিজের জন্য এজিদ রাজত্ব কায়েমে ব্যস্ত ও শঙ্কিত।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে অনেকগুলো বিষয় পরস্পরযুক্ত হয়ে একটি জটিল গ্রন্থি তৈরি করেছে। –

ক) ভুট্টো + বেনফরত + মালা + নাসিমা + আফরোজা।

খ) [মুম্বাই] নাহিদা (ভুট্টোর দ্বিতীয় স্ত্রী, বাঙালি) + নূর মোহাম্মদ + মখসুদ + সালেহা।

গ) সুরাইয়া (আবদুল্লাহ খুরোর স্ত্রী) + ভুট্টো।

ঘ) নাসিম।

ঙ) ভুট্টো + নূর মোহাম্মদ – প্রভৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের পুরাটাই নাসিম-কেন্দ্রিক। নাসিমের একটি সংলাপে পুরো উপন্যাসের মূল সুর – যা লেখকের আকাঙ্ক্ষিত – আভাসিত হয়ে উঠেছে : 'প্রথমে দেশ ও জাতির সাধারণ সমাজ, বিশেষ করে যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত ও বিপদগামীর পথ থেকে উদ্ধার করতে হবে। রক্ষা করতে হবে। তাদের রক্ষা করতে হলে অসুন্দর, অস্যেতের বিরুদ্থে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে আত্মদান, সাহসিকতা, ভয়শূন্য মৃত্যুর। এরকম সশস্ত্র বিপ্লবই আমাদের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। তা-ই আমাদের কাম্য।' – '... সশস্ত্র বিপ্লবই আমাদের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।' – নাসিমের এই উচ্চারণই 'ওয়ার্কার্স ফ্রেণ্ডস ক্লাব' বা 'শ্রমিক বন্ধু ক্লাব'-এর মূল উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে (১:৬) নাসিম যে রিভলবার জোগাড় করেও ব্যর্থ হলো, তা তার ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্যে – নাহিদার মায়াবী মুখশ্রীর জন্যে। বিপ্লবীর জন্যে ব্যক্তিগত সবরকম দুর্বলতা পরিত্যাজ্য – প্রথম খন্ডে নাসিমের ব্যর্থতা যেন এটাই শিক্ষা দিয়ে যায়।

'কাহিনীর গুণ বস্তুত একটিই : এর পর কী ঘটবে সে বিষয়ে শ্রোতাকে উৎকণ্ঠিত করে রাখা।' (Aspects of the Novel : E. M. Forster/ অনুবাদ : সুব্রত বড়ুয়া) নতুন দিগন্ত উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কাহিনী ছুটে চলেছে, অনেক পারস্পরিকতা ভেদ করে অনেক সময় এবং আখ্যান আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করে রাখছে, সম্মুখযাত্রিক করে রাখছে, উৎকণ্ঠিত করে রাখছে। প্রধানত করাচিতে বিভিন্ন পরিবেশের পটভূমিকায় স্থাপিত হয়ে কাহিনী একটি লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রথম খন্ড থেকে দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় খন্ড থেকে তৃতীয় খন্ডে অনন্যলক্ষ্য হয়ে চলেছে আখ্যান। কাহিনীর এই টান ঔপন্যাসিকের একটি আবশ্যিক গুণ। আবদুর রউফ চৌধুরীর অর্জনে আছে ঐ শক্তি।

তবে উপন্যাস তো শুধু কাহিনীর সংগ্রন্থন নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু– কাহিনীর ফ্রেম উপচে পড়াতেই তার অন্তিম সাফল্য। উপন্যাস কাহিনীকে ছাড়িয়ে কোনো তাৎপর্য কি অন্বেষণ করবে না? করবেই তো। *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসেও সেই সন্ধান আছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন একবার, 'শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাকচল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী।' অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কাহিনীসর্বস্ত আখ্যানের উপভোক্তা। আবদুর রউফ চৌধুরী এই কাহিনীমুখ্য উপন্যাসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর একটি বক্তব্য ছিল। সে-বক্তব্য তিনি প্রবন্ধ লিখে পেশ করতে পারতেন, অর্থাৎ সরাসরি। কিন্তা তা তিনি একটি উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। সজীব সবীজ একটি কাহিনীর মাধ্যমে। উপন্যাসের শিল্পরূপে চরিত্র-ঘটনা-পটভূমির যে বাস্তবতা-গ্রহণযোগ্যতা তা কি যথাযথ হয়েছে *নতুন দিগন্ত* উপন্যাসে? বিষয়টি আমরা একটু তলিয়ে দেখতে চাই। – (ক) পটভূমি হিশেবে নতুন দিগন্ত উপন্যাসে এসেছে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি শহর। সেখানকার উপরতলার মানুষের জীবনযাপনের ছবি তো বিশ্বাস্যই মনে হয়। আবার যখন বিপ্লবীদের দেখি, তারাও মনে হয় গ্রহণযোগ্য। (খ) চরিত্রগুলোকে লেখকের ইচ্ছার ক্রীড়নক মনে হয় না– তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা গভীর মিশেছে। এজন্যই ভুট্টো বা নাসিমকে কলের পুতুল মনে হয় না, রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়। লেখক অনেক মানুষকে নিয়ে এসে উপন্যাসের একটি ব্যাপ্তি দান করেছেন, – এবং যেমন বিষয় বা ঘটনার খুঁটিনাটির বর্ণনা করেছেন তেমনি উপেক্ষা করেননি কাউকে। ভুট্টোকে যে-গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই গুরুত্বই দিয়েছেন তার পরিচারিকা আন্নী বা পরিচারক নূর মোহাম্মদকে। এই সমদৃষ্টি সার্বত্রিকদৃষ্টি একজন ঔপন্যাসিকেরই চারিত্রলক্ষণ। (গ) উপন্যাসের প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায় আপাত-অলগ্ন, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়েই দেখতে পাই তাদের পরস্পরসংপৃক্ততা, তাদের বিজড়িমা। ঘটনার পর ঘটনা ঘটেছে উপন্যাসে। প্রথম অধ্যায়ে ভুট্টোর বাসভবনের অলস-বিলাসী আবহ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ট্রেনে নাসিমের করাচি শহরে আগমণ– সমস্তই যেন একসূত্রে গ্রথিত-পরিকল্পিত, তা ক্রমশ উদঘাটিত হতে থাকে। কিন্তু ঐ উদঘাটন দার্শনিক, প্রাবন্ধিক বা কবির মতন নয়– সমস্তকে ছুঁয়ে ছেনে চুম্বন করে আলিঙ্গন করে এগিয়েছে ক্রমাগত।

দ্বিতীয় খন্ডের অনেকখানি জুড়ে আছে কলকাতায় নাহিদার সঙ্গে নাসিমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্মৃতিচিত্র (২:১, ২:২)। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাসিমের সিদ্ধান্ত : 'না, নাসিমের জীবন-সিন্ধুতরঙ্গে নাহিদার হৃদয়স্পন্দন শোনার সময় নেই। সে মনকে দৃঢ় করার চেষ্টা করল; সর্বশক্তি একত্রিত করে, নতুন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে। আমার জীবনক্রম কোনো অবস্থায়ই ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। একটি নারীর জন্য। ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি বড়। তেমনি সমষ্টির চেয়ে স্বদেশ বড়। জাতীয়তাবোধ যার জন্মায়নি সে আন্তর্জাতিক বা বিশ্বায়নের মর্ম বুঝবে কী করে?' কলকাতা ও পার্বত্য ত্রিপুরায় নাসিম থেকেছে দীর্ঘকাল, কলকাতাতেই বস্তুত তার বিপ্লবের শিক্ষা– আত্মগোপন করেছিল ত্রিপুরায়। দ্বিতীয় খন্ডে অনেকখানি জুড়ে আছে নাসিম ও নাহিদার পূর্ব-প্রণয়কাহিনী– নাহিদার গর্ভজাত কন্যাকে সে যে 'নাসিমা' নাম দিয়েছে, সেও নাসিমের স্মৃতিরণনে : 'নাসিমা শব্দটি নাসিমের অন্তরের অজন্তাদ্বার উন্মোচন করে দিল। তাহলে তো আমার সম্মানার্থে, আমাকে অমর করার জন্য মেয়ের নাম রেখেছে না-সি-ম-আ। যতজনে যতবার মেয়েকে নাসিমা বলে ডাকে, ততবার পান করছে আমারই স্মৃতিসুধা।' (২:৪) ক্রমশ নাসিম বোঝে আসলে নাসিমা তারই ঔরসজাত। নাসিমের দু-একটি উক্তি থেকে তার চরিত্র বোঝা যাবে : '[...] মুক্ত-স্বাধীন দেশ তৈরি করার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। মুক্তির পথ সন্ধান করাই আমার সর্বস্ব।' (২:৫) 'আমরাও গরীব সাধারণকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি মাত্র; কারণ– ধনীরা নানান কারসাজিতে তাদের সম্পত্তি হরণ করছে– এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে অমাদের কাজ।' (২:৫)

প্রথম খন্ডের মতন দ্বিতীয় খন্ডও শেষ হচ্ছে নাটকীয় ব্যর্থতায়। নাসিমের বিস্ফোরক-ভরা বোতল হাতে ধরে ফ্যালে ভুট্টো। তা না-হলে ভুট্টো, খলকু খান, পাতৌদি (যাকে হত্যা করাই ছিল নাসিমের উদ্দেশ্য) নিহত হতে পারত। তৃতীয় খন্ড শুরু হয়েছে তাই নাসিমের নতুন পরিকল্পনায়। এই তৃতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়ই বস্তুত নাসিমের সমগ্র চিন্তা ও প্রতিজ্ঞার সারাৎসার সংকলিত হয়েছে একটি অনুচ্ছেদে : 'নাসিম মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে অনন্ত গগনে, অশ্রান্ত চরণে সর্বমণ্ডল প্রদক্ষিণ করতে চায়; কারণ– বাংলার মাটির কোলে জন্মগ্রহণ করেও বা জীবনের বড় একটি অংশ কাটিয়েও তার আত্মা তৃপ্তি পায়নি। মৃত্তিকার স্তন-রস-পিপাসা তার মুখে এখনও যেন লেগে আছে। মৃত্তিকাবক্ষের বিচিত্র ছবি তার চোখে জাগিয়ে তুলল 'নতুন দিগন্ত'। যুগ যুগান্তরের মহা-মৃত্তিকাবন্ধন তার পক্ষে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়; তাই তো ফিরে এসেছে মাটিতে পরম তৃপ্তি লাভ করতে, এই মাটিই তো তার অন্তরে জাগিয়ে দিচ্ছে বাংলার মুক্তি-জাগরণের বাণী। নাসিম মনে মনে বলল, সাইকেল প্রয়োজন হলে বিছানার পাশেই রাখব। শেষ হয়ে যায় যদি আমার প্রাণ, তবুও কেউ আটকাতে পারবে না। মাটির তিলক রেখাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি বলে গণ্য করব, এবং মাটির খুব কাছাকাছি থাকার বাসনায় তৃতীয়বারের মত বাসা বাঁধব এখানেই।' এই অনুচ্ছেদের লেখক-চিহ্নিত অংশ থেকেই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ঔপন্যাসিক। নিম্নরেখ বাক্যাংশটিতে লেখকের অভিরুচি ও অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হয়েছে।

৩.

কথাশিল্পী উইলিয়াম ফকনর-এর বিবেচনায় ঔপন্যাসিক 'ডিজাইন' নির্মাণ করেন উপন্যাস রচনার আগেই। আবদুর রউফ চৌধুরীর নতুন দিগন্ত উপন্যাসে ঐ নকশারূপেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনটি খন্ডে বিভক্ত উপন্যাসে অনেক চরিত্রের মধ্যে নায়ক চরিত্র নাসিম তার মূল লক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে কেন্দ্র করে যে-আখ্যান মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, সেখানে জুলফি আলি ভুট্টো একটি প্রধান চরিত্র। আপাত-প্রতিনায়ক নাসিমই এখানে নায়ক হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে একটি জাতির জাগরণের পরোক্ষ ইতিহাস মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু তারই সঙ্গে আছে ব্যক্তির অন্তর্গত অজস্র টানাপোড়েন। ভুট্টোর ব্যভিচার পরিষ্কার রূপায়িত যেমন, তেমনি দ্বিতীয় খন্ডের অনেকখানি ব্যয়িত হচ্ছে ভুট্টোর দ্বিতীয় স্ত্রী নাহিদার সঙ্গে নাসিমের সম্পর্কের বর্তমান ও অতীত চারণায়। ভুট্টো ও নাসিম, দুজনেরই রাজনৈতিক জীবনকে-যে ব্যক্তিজীবন অনেকখানি প্রভাবিত করেছে, এ দেখিয়েছেন লেখক। প্রকৃতই রাজনীতি বা আদর্শ ব্যক্তি-বা-জীবন-বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। ফলে চলেছে অনেক কূট জটিলতার বুনন। তারই মধ্যে দু-দুবার ব্যর্থ হওয়ার পরেও নাসিম শেষপর্যন্ত তার উদ্দিষ্ট কাজ হাসিল করতে সক্ষম হলো, একেবারে শেষ দৃশ্যে না-পৌঁছোনো পর্যন্ত আমরা তা জানতে পারি না। নাসিমের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও এখানে তার মূল মঞ্জিলে পৌঁছেছে।

অনেক চরিত্র : জুলফি আলি ভুট্টো, আন্নী, বেনফরত, নূর মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ খুরো, নাসিম আহমেদ, ফারুক, পারভেজ, যতীন চক্রবর্তী, মতিন, অন্তার, জমাদারনী, ফিতেওয়ালিনী, মালা, নাসিমা, আফরোজা, মখসুদ, নাহিদা, সালেহা, সুরাইয়া, মিস মরিয়ম, নজর মোহাম্মদ খান, আকরাম, খোদেজা, নবাবজাদা খুরশিদ আহমদ পাতৌদি, হেদায়েতুল্লাহ, মালতী, সাজেদা বেগম, গাফফার, খলকু খান, জামশেদ, রোকসানা, আজমান আলি, হায়দার জংগ, সুরতজান, নীলুফা, সারওয়ার, খসরু খান, নিয়ামতুল্লা, আইয়ুব খান, খোদাদাদ খান, ভিকারুননেসা, বিলকিস আহমদ, নাদিম শাহ প্রমুখ। প্রধান চরিত্র দুটো : নাসিম ও ভুট্টো। বেনফরত, আবদুল্লাহ খুরো, নাসিমা, সুরাইয়া, আন্নী প্রমুখকে মাঝে মাঝেই আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলো যেন একটি আবর্তে ঘূর্ণ্যমান। নাসিম, আন্নী,

নাসিমা, পারভেজ– প্রধান-অপ্রধান এই চরিত্রগুলো জীবনতরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত যেন। এই চরিত্রগুলো আবার সমাজের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে। যেমন : আন্নী। সুদেহিনী আন্নী যেন বিধিসম্মত বলেই মেনে নিয়েছে তার মনিবের মনস্তুষ্টি (এক্ষেত্রে শরীরতুষ্টি) সাধন। শেষপর্যন্ত যখন সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তখন তার প্রভু ভুট্টোর অবহেলাকে ভুট্টোরই চরিত্রানুগ বলে মনে হয়। আবার আন্নীর সপক্ষে যে দাঁড়ায় সে-ই নাসিমা হ তো প্রতিবাদ করে তার রক্তধারার কারণেই– ভুট্টো জানে না সে নাসিমের সন্তান, নাসিমা নিজেও জানে না। বেনজিরের সঙ্গে তার চারিত্রিক পার্থক্য হয়তো এ কারণেই। নাসিমার জীবনের ওঠাপড়া হয়তো সবার চেয়ে বেশি, তার অন্তর্দ্বন্দ্বও, নাসিমকে সে পাতৌদির অবস্থান জানিয়ে দেওয়ার পরে তার দ্বৈততা সাক্ষ্য দেবে হয়তো তার। যে-পারভেজকে চকিত একবার দেখা যায় প্রথম দিকে, উপন্যাসের শেষে সে ফিরে আসে। সে অনেকখানি নাসিমের মতন দেখতে, এটা কি বাস্তবের বাইরে অন্য কোনো প্রতিরূপের ইঙ্গি দ্যায়?

চরিত্রনির্মাণে লেখকের প্রধান একটি হাতিয়ার সংলাপ। করাচির মুখ্য পটভূমিতে যে-উপন্যাস, স্বাভাবিকভাবেই তার সংলাপের ভাষা হতে পারে উর্দু। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যানে তো এ ভাষা অবিরল ব্যবহার কলা সম্ভব নয়। উপন্যাসে বাঙালি নাসিমের প্রবেশের পরে প্রথমেই প্রসঙ্গটা এসেছে : 'লাহোরের অদূরে ওয়াগার সীমান্তরক্ষী পাকিস্তানি এক সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাসিমের। সেপাই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুছি কোন হু?' জবাবে নাসিম বলল, 'মে পাকিস্তানি হ্যায়।' পরক্ষণেই 'হ্যায়'র স্থলে 'হু' যোগ করল, এভাবে যে, 'হ্যায়' বা 'হু' একটা-না-একটি তো শুদ্ধ হবেই; কারণ– স্কুল-কলেজ জীবনে যে পয়লা 'ছবক' নিয়েছিল তা থেকে সে জানে, চলতি বাংলা বাক্যের শেষে 'হ্যায়' নয়ত-বা 'হু' একটা কিছু যোগ করলেই চৌদ্দ-আনা উর্দু হয়ে যায়।' [১:২]

এই নাসিম ক্রমে উর্দুভাষা অনেকখানি আয়ত্ত করে, এমনকি উর্দু দৈনিক 'জংগ' পত্রিকাও পড়তে পারে। লেখক সংলাপের প্রয়োজনে উর্দু প্রয়োগ করেছেন। যেমন :

– মেয় আকরাম সাহাবকা সাথ মোলাকাত কারণা চাহাতা হুঁ।

– কিঁউ, কিয়া বাত হে?

– আপ আকরাম সাব হে!

– জ্বি, ফরমাইয়ে। কিয়া চাইয়ে?

– এক খামুস রিভলবার কি জরুরত।

– রিভলবার সে কিসকো কাবু কর না হে বাবু?

– কাশ্মিরিওঁ পে যও জুলোম কারতে হে ইন কো।

– মে ও সব নাহি জানতা। স্রেফ এ জানতা হুঁ কে খাও, পিও অর এশ্‌ক্‌ কার। দুনিয়া লিখনে কি জাগা হে। ...

[১:৫]

তবে প্রায় সারা বইয়েই স্বাভাবিকভাবে বিশুদ্ধ চলতি বাংলাতেই সংলাপ চলেছে, তার মধ্যেই পরিচারক-পরিচারিকাদের সংলাপে লেখক কখনো বাংলাদেশের (সিলেটের) উপভাষা বা সাধুভাষা ব্যবহার করে চরিত্রকে বাস্তবায়িত করেছেন। যেমন অন্তার এবং লাল ফিতেওয়ালিনীর (নামহীন) সংলাপ :

– হারামজাদি, তুই আমার পুরুষটারে নিয়া টানাটানি করতাছিস ক্যান?

– ইতাসব মিছা কথা ।

– দেহে নাই ল্যাস, কথায় শুধু ঠ্যাস ঠ্যাস ।

– রাখতে পারতাছিস না তারে দইরা, এখন আমারে দিতাছিস গালি । সে কি তর কিনা মাঔগ!

– ছিনালির ঘরের ছিনালি; বান্দির ঘরের বান্দি । আইজ তর একদিন না হয় আমার একদিন, তরে আর কোনোদিন রান্নাঘরে ঢুকতে দিমু না ।

[১:৩]

কিংবা মালার সংলাপ :

– আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাদেরকে খুঁজিতেছি । কিন্তু কোথায়ও পাইতেছি না ।

মানুষ কি রাস্তাঘাট অথবা বাড়িঘর সবকিছুরই খুঁটিনাটির বর্ণনা দেন লেখক । কিন্তু লক্ষনীয় : পুরো উপন্যাসের ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে (কখনো অবশ্য স্মুতির মধ্য দিয়েও) করাচি, মুম্বাই এবং কলকাতায় । ঢাকা তথা বাংলাদেশে নয় । এটাও খানিকটা আশ্চর্যের । এই নৈঃশব্দ্য । যে-দেশ সম্পর্কে তিনি বলতে চাচ্ছেন তার সম্পর্কে পূর্ণ নীরবতা । তবে উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের ব্যাপারে লেখক সবসময়ই দেশজ– তাঁর নিহিত বাঙালিত্বের প্রতীক । একমুঠো উদাহরণ :

১. রূপোর ট্রে থেকে কফির কাপ হাতে নিয়ে ভুট্টো চুমুক বসাতে-না-বসাতেই আন্নীর হৃদয় ও অন্তর পুড়ে সেখানে এক অদ্ভুত হাসি খেলে উঠল । মাছরাঙার রঙিন পালক থেকে ময়ূরকণ্ঠী রস নিংড়ে নেওয়ার আকর্ষণ-অনুভব যেন । [১:১]

২. নৌ-বিমানের ওঠানামা অবলোকন তার খুব প্রিয় ছিল । রাজহংসের মত ডানা মেলে গ্রীবা উঁচু করে পানির ওপর ভেসে বেড়াত উড়োজাহাজগুলো । সমুদ্রসৈকতের এক পাথরখণ্ডের উপরে বসে দূরদিগন্ত পানে তাকিয়ে থাকত নাসিম; যেখানে আকাশ নতজানু হত বারিধিপদে, সেদিকে; আর আশমানের এই নতি স্বীকারে তরঙ্গবালাদের কলহাস্য ভেসে আসত তার কর্ণকুহরে, কোকিলের কুহুকুহু ধ্বনির মত মনমাতানো শব্দ যেন । [১:২]

৩. [...] শাড়িতেই মেয়েদের মানায় ভালো । পরিপাটি করে পরতে পারলে পাশের পুরুষের উশকুশ শুরু হয়ে যায় । ট্রাউজার দরজির বিদ্যার দৌড় প্রকাশ করে মাত্র, আর শাড়ি হচ্ছে স্বকীয় মেজাজ-মর্জির সুশ্রী প্রকাশ । একটি রেস্তোরাঁর ফরমাশি খাবার, আর অপরটি স্বহস্তে পাকানো চিতলের কোপতা । [১:৩]

৪. [নাহিদার ভাবনা] আমি দুষ্টু ছিলাম । আজও দুষ্টুই রয়ে গেলাম । ভুট্টোকে সমস্ত দেহমন দিয়ে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারেনি; তা সম্ভব হয়নি বলেই বোধহয় অতীতের সুখস্বপ্ন মধুর স্মৃতিকে সজীব করে রাখতে চাই; ভাষা-আন্দোলনের শহীদের স্মরণে তৈরি মিনারের মত । একমাথা ঝাঁকড়া তামাটে-কালো চুল, পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা, বাঘের মত থাবা দেওয়া পেশী, বিড়ালের মত চোখ কী ভোলা যায়! [১:৩]

৫. [পাতৌদির হত্যার ব্যাপারে নাসিমের চিন্তা] বঁড়শিবিদ্ধ বড় মাছের মৃত্যুর সঙ্গে ধস্তাধস্তির দৃশ্য-উপভোগ-আনন্দের সঙ্গে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে কুচ বা জগর দিয়ে এক-ঘা'য়ে মাছকে জব্দ করার আনন্দের কোনো তুলনাই হয় না। [১:৪]

৬. সুদর্শনা আন্নী চা-কফি-ভর্তি মস্ত বড় একটি সিন্ধি ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। পরনে সিন্ধ-নীল সালোয়ার। কামিজে হরেকরকম আয়নার কাজ। মাঝে মাঝে লাল-নীল সুতোর বাহার। আন্নীর মনে পড়ল, এ-পোশাক দেখে ভুট্টো সেদিন চিলের মত জাপটে ধরেছিল তাকে। [১:৪]

৭. সৎমা যে তার অপরূপ সুন্দরী, এতদিনে তা যেন তার নজরে পড়েনি, স্বর্গের অপ্সরী কৈলাসবাসে দেবকাম্য উর্বশী যেন, বেহেশতের ছবিও বলা চলে, সপ্তাকাশে বিহারিণী নূর, কবির কল্পিত বিস্ময়, স্রষ্টার সৃষ্ট প্রথম নারীর চেয়েও রূপসী সে। [২:৪]

৮. হঠাৎ নাহিদার মেজাজ বিগড়ে গেল, যেন আকাশের ঈশানকোণে কালবৈশাখী কালীর কালো চুলের অন্তরাল থেকে শত শয়তান সহস্র পক্ষ বিস্তারে কালিমাবৃত করল ধরাতল, সে সঙ্গে নাহিদার অন্তরও। [২:৫]

৯. ভোরের পাখির ডানা ঝাপটার শব্দ যেন তার কানে একতারা বাজাচ্ছে। [২:৫]

১০. হঠাৎ একটি জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ভুট্টো। জানালা খোলা; ঘরের মধ্যে মৃদু আলো ঝলছে; তারই মাঝে বিল-জোড়া পদ্মের মত একটি নারীমূর্তি ফুটে আছে, ওর ঝাপসা রূপ যেন পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলকে উঠেছে। [৩:৩]।

১১. মুখকে পাতিলের পিঠের মত করে ধমক দিল বেনফরত; এ প্রগলভতায় অপ্রতিত হল নাদিম; কিন্তু পরক্ষণে মেঘের আড়ালে বিজলি চমকে উঠল। [৩:৩]

এই উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ যেমন লেখকের দেশজতা-ইতিহাসচেতনাকে উদ্ভাসিত করে, তেমনি বর্ণনার মধ্যে এরকম কথা ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : 'ব্যক্তিবিশেষের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। ব্যক্তির বিকাশ মানেই সমাজের উন্নতি, আর উন্নত সমাজে ব্যক্তির বিকাশ আরও উন্নত মানের ও সহজতর হয়; কারণ– সামাজিক সত্ত্বা ব্যক্তির বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু বিবেক ব্যক্তিসত্ত্বার নির্ধারক নয়।' (১:৫)

আবদুর রউফ চৌধুরীর স্রোতে-প্রতিস্রোতে আবর্তমান নতুন দিগন্ত উপন্যাসটি যত বড় তার চেয়ে মনে হয় অকেন বৃহৎ। এই ব্যাপ্তি উপন্যাসটির পৃষ্ঠাসংখ্যার চেয়ে বেশি। সুনিবদ্ধ কাহিনী, অগণন চরিত্র, উজ্জীবিত সংলাপ, স্বগত সংলাপ, স্মৃতি, ইতিহাস, বিশ্লেষণ, বর্ণনা– সবকিছু ছাপিয়ে যায় লেখকের জীবনবেদ॥

আবদুল মান্নান সৈয়দ

৮ই ফাল্গুন ১৪১১